Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 45 – 51
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানুষ : নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পের আলোকে

সুস্মিতা ব্যানার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ইমেইল : susbanerjeee1@gmail.com

Keyword
দেশভাগ, উদ্বাস্তু, পুনর্বাসন, এন আর সি, রিফিউজি, ডি ভোটার।

Abstract
স্বাধীনতার নামে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বাঙালির জীবনে এনেছিল ঝড়ের বার্তা। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সবচেয়ে সংকট ছিল ধারাবাহিক দাঙ্গা, যার ফসল এই দেশভাগ ও ছিন্নমূল সমস্যা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দেশভাগের ফলে বহু প্রজন্মের বাসভূমি থেকে যাঁরা উৎখাত হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে চরম বিপন্ন অবস্থায় আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় পাড়ি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুতির ভরসায় প্রব্রজন ও পুনর্বাসনের নতুন বাস্তবে ছিন্নমূল বাঙালিদের সে বিশ্বাস অচিরেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। শুরু হয় দুঃসহ জীবন অভিযানের মধ্যে দিয়ে আবার পরিচয় তৈরি করার লড়াই। যে লড়াই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন আদলে ভিন্ন ভিন্ন নামে এসে হাজির হয়েছে। তবে এ সব সমস্যার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব রয়েছে দেশভাগের। তাইতো আজও আমাদের কখনও কখনও নিজের দেশ কোনটি তাঁর উত্তর দিতে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। স্বভাবতই এই বিপন্ন সময়ের ক্ষত সাহিত্যকেও ছুঁয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যেও দেশভাগ ও তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতি অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। আর এই বিপন্ন সময়ের আত্মকথাকে তুলে ধরতে বাংলা কথাসাহিত্যের ছোটগল্পের শাখাটিও বেশ জোড়ালো। সাম্প্রতিককালের লেখা বহু ছোটগল্পে দেশভাগ ও দেশত্যাগের সৃষ্ট সমস্যাকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিবন্ধে কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা ও সমস্যাজনিত সংকটকে বুঝে উঠার চেষ্টা করব।

Discussion
আজ চারিদিকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপনের আনন্দ তবে এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে আমাদের অন্তর আত্মায় স্বাধীনতার নামে ১৯৪৭ এর দেশভাগের ক্ষত। স্বাধীনতার নামে যে দেশভাগ তা মানুষের কাছে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া, শিকড় ছিন্ন হওয়া, চেনা প্রতিবেশি বাড়ি একমুহুর্তেই অচেনা হয়ে যাওয়া, বন্ধুর চোখে সন্দিহান হওয়া, চারিদিকে দাঙ্গা, হিংসা, উদ্বাস্তু, নির্যাতন, ধর্ষন, শোষণ ইত্যাদিরই প্রতিরূপ।

“আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো
পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি।”
(‘দেশহীন’, শঙ্খঘোষ)

সত্যি, আজ শুধু আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত বুকে নিয়ে পালিয়ে আসা, ছেড়ে আসার স্মৃতিই বুক জুড়ে। শুধুমাত্র একটা মানচিত্রের দেওয়াল দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল ছিন্নমূল সামূহিক অস্তিত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় সংকট ছিল ধারাবাহিক দাঙ্গা, যার ফসল এই দেশভাগ ও ছিন্নমূল সমস্যা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দেশভাগের ফলে বহু প্রজন্মের বাসভূমি থেকে যাঁরা উৎখাত হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে চরম বিপন্ন অবস্থায় আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় পাড়ি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুতির ভরসায় - প্রব্রজন ও পুনর্বাসনের নতুন বাস্তবে ছিন্নমূল বাঙালিদের সে বিশ্বাস অচিরেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। শুরু হয় দুঃসহ জীবন অভিযানের মধ্যে দিয়ে আবার পরিচয় তৈরি করার লড়াই। যে লড়াই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন আদলে ভিন্ন ভিন্ন নামে এসে হাজির হয়েছে। তবে এ সব সমস্যার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব রয়েছে দেশভাগের। তাইতো আজও আমাদের কখনও কখনও নিজের দেশ কোনটি তাঁর উত্তর দিতে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

স্বভাবতই এই বিপন্ন সময়ের ক্ষত সাহিত্যকেও ছুঁয়ে গেছে। দেশভাগ চর্চা কিন্তু প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছে এই একবিংশের আরম্ভ থেকে। ৫০-৬০ বছর কেটে যাওয়ার পর প্রকৃত আত্মনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আসলে সময় থেকে দূরে দাঁড়িয়ে বাঙালি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে তার হারানো দেশ– হারানো মানুষ। আর এই বিপন্ন সময়ের আত্মকথাকে তুলে ধরতে বাংলা কথাসাহিত্যের ছোটগল্পের শাখাটিও বেশ জোড়ালো। সাম্প্রতিক কালের লেখা বহু ছোটগল্পে দেশভাগ ও দেশত্যাগের সৃষ্ট সমস্যাকে বিষয় হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে। এই নিবন্ধে কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা ও সমস্যাজনিত সংকটকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করব। উদ্দিষ্ট এই নিবন্ধে থাকবে মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ‘গল্প ও গল্পগুলো’, দীপক চক্রবর্তীর ‘উদ্বাস্তু’, স্বপ্না ভট্টাচার্যের ‘উজান’, নিলিপ পোদ্দারের ‘বাস্তুভূমি’ গল্পের বিষয় ভিত্তিক আলোচনা।

দেশভাগ ও তার পরবর্তী সময় জুড়ে অবাঙালির চক্রান্তের ফলে বাঙালির স্থায়ী বাসস্থান হারানোর ভয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উত্তরপূর্বের বিশিষ্ট গল্পকার দীপক চক্রবর্তীর ‘উদ্বাস্তু’ গল্পটি। ‘উদ্বাস্তু’ শব্দটি যে কত ভয়াবহ যা কেড়ে নিয়েছে শতশত লোকের ভিটেমাটি, সন্তান, জন্মভূমি সবকিছু। এই একটি মাত্র শব্দবন্ধ কীভাবে স্মৃতিচারণায় চুয়াল্লিশ বছর পরও নীহারেন্দু বাবুকে তাড়া করে, তা-ই flash back এর অনুক্রমে গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে।

স্বাধীনতার নামে যে দেশভাগ হয়েছিল তা বাঙ্গালির আদিপাপ। আসলে স্বাধীনতা তাদের কাছে বাস্তহীন। সেইসময় থেকে শুরু করে আজ অবধি বাঙালিদের শুধু নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত করার চক্রান্ত চলেছে – কোথাও তাদের স্থায়ী জায়গা নেই। এই ভয়ই পুরো ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে হাতছানি দেয়। ১৯৭১ এর বৈশাখে নীহারেন্দু বাবু তার পরিবারকে অন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে করে হাফলং বাগানের পাশে একটি ক্যাম্পে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। এই থেকে শুরু হয়েছিল নীহারেন্দু বাবুর লড়াই, আজ এত বছর পরও তাঁর একই লড়াই চলছে। ‘উদ্বাস্তু’র সময় প্রেম, প্রীতি, ক্রোধ কিছুই থাকে না, মানুষ পশুর মতো বাঁচে। কীভাবে দিনের পর দিন ক্যাম্পে ক্ষুধা-সর্বগ্রাসী, পেটের ক্ষুধা, জীবনের ক্ষুধা, ক্ষমতার ক্ষুধা, সাম্রাজ্যের ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করে দিনযাপন করেছিলেন আজও নীহারেন্দুর মতো লোক ভুলতে পারেন না। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আবার নতুন করে বসত বাড়ি স্থাপন করেও তারা স্বস্তি নিতে পারছেন না। নীহারেন্দুর আজও মনে আছে তাঁর মেয়ে মিনুর চলে যাবার ভয়ঙ্কর দিন-রাতের স্মৃতি। নীহারেন্দু হাজার চেষ্টা করেও বাসের অযোগ্য ক্যাম্পের সর্বগ্রাসী হাত থেকে মেয়েকে বাঁচিয়ে পলায়ন করতে পারেন নি। শেষপর্যন্ত ‘দাস্ত বমি’ হয়ে

মিনু মারা যায়। মিনুর শেষ ক্রিয়াটুকু ভালো করে করতে পারে নি সর্বহারা উদ্বাস্তু পিতা। এক পিতার কাছে এর থেকে বড় দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। সন্তানের নিথর মুখ, বড় নিষ্ঠুর দৃশ্য।

> "আরো নিষ্ঠুর, মেয়েটার শেষকৃত্যটুকুও করা গেল না ঠিকঠাক ভাবে। একটু ফুল নেই, চন্দন নেই, ধূপ নেই, কিছুই নেই যেন আবর্জনা কোনো রকমে দূর করে দিয়ে আসা।"[১]

কারণ অসহায় নীহারেন্দু তখন উদ্বাস্তু ছিলেন। উদ্বাস্তুদের যে সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা কিছু থাকতে নেই শুধু পশুর মতো নিজের পেটে দুমুঠো দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর পর সে রাতেই **১৯৭১** এর **১২** মে নীহারেন্দু আর তার স্ত্রী শোভা ছেলেকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে শ্রীপুর কালিবাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলেন। তারপর মনাকাকাকে অবলম্বন করে নীহারেন্দু শেকড় বিছানো শিলচরে। আজ নীহারেন্দু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ছেলে সুসিত ও ছেলের বৌ তাদের সকলকে নিয়ে যথেষ্ট গভীরে শিকড় গ্রোথিত করে আছেন। তবু এখনও সেই বৈশাখি রাতের অন্ধকার নীহারেন্দুকে গ্রাস করে নেয়। সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়ে পড়েছিলেন,

> "Foreigners who came to Assam on or after March 25, 1971 shall continue to be detected, deleted and expelled in accordance with the law. Immediate and pratical steps shall be taken to expel such foreigners।"[২]

সেই 'রায়' পড়ার পর থেকে সারাদিনই ভীত, সন্ত্রস্থ হয়ে থাকেন নীহারেন্দু। তিনি মনে মনে জানেন 25 March এর পর তিনি এসেছেন এই দেশে তাই ছেলে যতই বলুক এন আর সির সব কাগজ ঠিকঠাক দিয়েছি তথাপি তাঁর ভয় কাটে না। তিনি কেমন যেন হয়ে যান এন আর সি-র কথা ভাবলে কারণ তিনি **৭১** এর সেই রক্তাক্ত দিনগুলি নিজের চোখে দেখেছেন। আসলে 'ক্যাম্প' শব্দটা আজকাল নীহারেন্দুর মনে প্রবল ঝড় তোলে। সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক ছায়া মেলে থাকে তিনি ভাবেন,

> "এই বুঝি পুলিশ এসে দরজায় বেল বাজাল। চেয়ারের দুই হাতল শক্ত করে ধরে বসেন, যেন প্রতিরোধ গড়তে চান অজান্তেই। অথচ সমস্ত প্রতিরোধই যেন ভেঙে পড়ে। এক অদ্ভুত ভয়, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।
> নীহারেন্দু দেখেন একটা ট্রাকের পেছনে তোলা হয়েছে তাদেরকে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূরে। ...অস্থিরতায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নীহারেন্দু। চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। - শোভা কই গেলায়? শোভা দেখ মিনুয়ে পাতলা পায়খানা করের। ও শোভা।"[৩]

আসলে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছিল রিফিউজি ক্যাম্প আর অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা।

ক্যাম্পের ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখন সব সময় ঘোরপাক খায় নীহারেন্দুর মাথায় আর শ্বশুরের চোখে দেখা **৭১** এর ভয়াবহ রূপ দেখে সুচেতাকেও কিছু মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো স্থির করে দেয়। (NRC) ন্যাশনেল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস এর নামে বাঙালিদের স্বদেশবিচ্যুত করার যে চক্রান্তজনিত ভয় সুচেতাকেও গ্রাস করতে থাকে ধীরে ধীরে। সুচেতা সংসার-ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকে আর ভাবে তার এত দিনের সাজানো সংসারে কালো মেঘ তৈরি করবে রাষ্ট্রীয় কানুন আর আসামের বাঙালি বিদ্বেষী রাজনীতি। তাই রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভে তার প্রশ্ন, শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার সুবাদে তাকে এত অপমান-হেনস্থা-অবিচার সহ্য করতে হবে। ক্ষোভে আক্রোশে সুচেতা বলে ওঠে-

> "চুয়াল্লিশ বছর পরও মানুষের মন থেকে ভয় আর অসহায়তা যায় না। পূর্ববঙ্গ কি দেশভাগের আগে ভারতের বাইরে ছিল? তবে! কেন্দ্র আর রাজ্য কি ইতিহাস মানে না।"[৪]

শব্দের ছন্দময় গতিশীল প্রকাশে বর্তমান সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা বরাক উপত্যকার বাঙালিদের বাস্তব গল্পই যেন মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'গল্প গল্পগুলো' গল্পের কতকথা।

"যা শুনে শ্রোতা ঘোর চমকের সঙ্গে আঁতকে ওঠে, কখনও পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে নিদারুণ রোমহর্ষক বা চূড়ান্ত অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবে ওগুলো কিন্তু সব রণক্লান্ত জীবনের সত্যি গল্প। কখনও বলতে হয় না যা শুনেছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিংবা কারো জীবনের সঙ্গে কখনও মিল খুঁজে পেলে তা হবে নিতান্তই কাকতালীয়!"[৫]

গল্পে দেখি সাত্যকী সাইকেলের কেরিয়ারে করে একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে যেতে যেতে সবার কাছে একটা গল্পবীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেল যে,

"আপনাদের ওই বরফকলের গলিতে বেজায় ভিড় দেখে এলাম।"[৬]

তারপর সবাই এই গল্প সম্পর্কে অনুমান করতে থাকে অনেক ঘটনাই, যেমন- সিঁদ কেটে বা গ্রিল ভেঙে চুরি-ডাকাতি; বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভায়ে ভায়ে কাজিয়া; কোনও সবলপেশি প্রতিবেশির অবৈধ ভাবে গলিপথের অংশ দখল; কারও বাড়ি থেকে সোমথ মেয়ের উধাও হয়ে যাওয়া; কোনও স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা; কারোকে ভূতে পাওয়া এবং সর্বোপরি ডি-ভোটার সমস্যা হবে, কেউ হয়ত হঠাৎ করে নোটিশ পেয়েছে। কারণ ঘটনাটি আজকাল খুবই কমন, বিশেষত তৃণমূলবাসীদের ডি-ভোটার করার এক সর্বব্যাপ্ত সুগভীর ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। তাছাড়াও অনেকক্ষেত্রে এটি ঈর্ষাপরায়ণ কোনও ব্যক্তি গোষ্ঠির পরিচিতজনের বিরুদ্ধে অহেতুক প্রতিশোধ স্পৃহা মেটানোর বা তার টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি হাতানোর অন্যতম হাতিয়ারও এটা। প্রতিদিনের জীবনাচরণ, উপলব্ধির মাত্রান্তর স্থায়ী ছাপ রেখে যায় মিথিলেশ ভট্টাচার্যের চেতনায় ও তার রচনায়। তাই প্রতিদিনের শুনা ঘটনাই 'গল্প গল্পগুলো' গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে এসেছে।

১৯৯৭ সালের ১৭ জুলাই ভারতের নির্বাচন কমিশন অসম রাজ্য সরকারকে ভোটার তালিকা থেকে নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের সরানোর নির্দেশ দেয়। এরপর থেকেই অসম রাজ্যে নির্বাচনী ভোট গ্রহণের তীব্র সংস্করণ হওয়া শুরু হয় ও শুধুমাত্র বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু হয়। যারা তাদের নিজেদের বৈধ নাগরিকত্বের সপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি, নির্বাচনী তালিকায় যাদের নামের পাশে ডি লেখা হয়, যা তাদের সংশয়াপন্ন ও বিতর্কিত হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের নাগরিকত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই তালিকা চলাকালীন সময়ে বাড়িতে না থাকা ভোটারদের নামের পাশেও ডি লেখা হয়। এই হালনাগাদ চলাকালীন সময়ে কোনোভাবে অনুপস্থিত থাকা ভোটাদেরও ডি ভোটার বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এছাড়াও বাসস্থান পরিবর্তন করে অন্য গ্রামে বসতি স্থাপন করা ব্যক্তিদেরও ডি ভোটার হিসেবে ঘোষণা করার নজির দেখা যায়। এভাবেই আসাম চুক্তির কৌশলকে হাতিয়ার করে আসামকে বাঙালি শূণ্য করার চক্রান্ত চলতে থাকে অবিরত।

এই গল্পেও পরপর তিনটি ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই, যেগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি গল্প হল, সকাল বেলা খালেরপাড়ে তরণী মণ্ডল নামে এই এলাকার পাশের কোন একটি গ্রামের লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। হাত-পা বাঁধা। শরীর পচে ফুলে উঠেছে। বেশ ক'দিনের বাশি মড়া হবে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ নিয়ে নানা মানুষ নানাকিছু ভাবছে। এই মৃতদেহকে ঘিরে জমায়েত লোকেদের মধ্যে থেকে গল্পকথক হারুকে বলে উঠে দাঁড়িয়ে, এখানে এতো ভিড়-কথাবার্তা সবকিছু মৃতদেহকে ঘিরে কিন্তু দশরথ আর মনোরথের বেলা ওরকম হয়নি। এমনকি গ্রামের মানুষও ওদের কথা কিছু বলতে পারে নি। তখন –

"অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে বলে শ্রোতা।
ওরা দুজন কোন গ্রামের লোক দাদা? হারু বিষ্ময়ের সঙ্গে শুধোয়।
ধারে-কাছেরই। কান্দিগ্রাম।
ওরা দুজন বুঝি খুন হয়েছে, ওদের লাশও জলে ভাসিয়ে দিয়েছে? উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চায় হারু।
না না। খুন নয়। লাশও জলে ভাসায় নি কেউ। তবে এই সংসার-জলে এমন অথৈ ভাসান হয়েছে ওদের-খুন থেকেও অনেক বেশি জঘন্য চক্রান্তের শিকার ওরা। বেঁচে থেকেও মরা, কেউ বলতে পারে না ওরা কোথায়, কেমন আছে।"[৭]

আসলে দিনমজুর দারিদ্র দশরথ আর মনোরথে হাতে একদিন হঠাৎ পুলিশ বিদেশি নোটিশ ওদের ধরিয়ে দিয়ে তুমুল বৃষ্টি ঝরা অন্ধকার রাতে দুজনকে ঠেলে দেয় বাংলাদেশে, 'কাঁটাতারের ওপারে'। ওদের অসহায় বৌ ছেলে-মেয়ের কথা কেউ ভাবে নি, জিজ্ঞেসও করেনি। সে দেশেও তাদের স্থান হলো কি না এ খবরও কেউ রাখে নি। আসলে এসব অন্যায়ের বিচারটা করার কেউ নেই কারণ সকলকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের উপর তারাই তো আজ সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এভাবেই ক্রমাগত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের যৌথ উদ্যোগেই চলছে বাঙালির নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত। যার ফলশ্রোতীতে কত মানুষ প্রাণ হারায়, কত মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, কত সংসারে দেখা দেয় ভাঙন।

তারপর সাত্যকীর ছড়িয়ে দেওয়া গল্পবীজের রহস্যের উন্মোচন হয় বিকেল বেলা। সকাল থেকে উন্মাদের মতো কী সব কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে সহায়।

> " 'আমি তরণী, তরণী মণ্ডল। আমাকে যারা মেরেছে তাদের সবকটার আমি পুলিশকে বলে দেব'...। 'আমাকে গ্রাম ছাড়া করতে চায় ওরা। আমি নাকি বাংলাদেশি। আমার সব কাগজপত্র, সার্টিফিকেট ওরা ছিঁড়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওই লোকগুলো আমার জমিবাড়ি দখল করতে চায়। আমি ডি-ভোটার বলে নালিশ জানিয়েছে কোর্টে'..."[৮]
>
> "শুনুন সবাই, আমাকে গলা টিপে মেরেছে ওরা। হাত-পা বেঁধে রাঙ্গির খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওদের প্রত্যেককে আমি চিনি। সকলের নাম পুলিশেকে বলে দেব। দয়া করে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন...।"[৯]

সহায়ের কথা থেকে সহজেই তরণী মণ্ডলের হত্যা রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। ডি-ভোটার নিয়ে করা জঘন্য চক্রান্তের খোলসা সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু এ খোলসা করবে কে? করবার মতো লোক কোথায়? প্রত্যকটি প্রশ্ন নিঃস্বভাবে হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে আমাদের সঙ্গে। তাই আমাদেরকেই এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেকেই প্রতিবাদ করতে হবে। নইলে হয়তো তরণী মণ্ডল, দশরথ, মনোরথের মতো একদিন আমাদেরকেও এই ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে। তাই লেখক আমাদেরকে এই গল্পকথার মধ্যমে যেন সাবধান বানী শুনিয়ে দিতে চান।

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'গল্প গল্পগুলো' গল্পের চরিত্রগুলির উপস্থিতি সমকালের জটিল অবস্থার বিশ্বাসযোগ্য ছবি মেলে ধরে এবং আত্মার দোসর হয়ে পাঠকের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সত্যস্বরূপকে গোপনীয়তার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে। আসলে এই গল্পের চরিত্রগুলি যেন আমাদেরই নিজস্ব সত্তা। তাই সহায়ের মতো আমাদের নিজস্ব সত্তাও যেন চিৎকার করে জানাতে চায় এই প্রতারণার বিরুদ্ধে তীব্র বিরুধীতা।

স্বপ্না ভট্টাচার্যের 'উজান' গল্পে আছে কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষিতীন্দ্রমোহনের দেশভাগের স্মৃতি বেয়ে আসা নতুন বাস্তু গড়ে তোলার সংগ্রামের কথা। তেমনি আছে নতুন আবাস-নতুন সম্পর্কের ভিন্নকথা, আছে সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনের নানান আভাস, সম্পর্কের মূল্যবোধের আরো বেশি ঝকঝকে স্পর্শতা।

'উজান' গল্পে যেমন আছে দেশভাগের স্মৃতি, তেমনি আছে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের পুনর্নির্মাণের চেষ্টা। দেশছাড়ার ক্ষত বুকে নিয়েই শুরু হয় ক্ষিতীন্দ্রমোহনের জীবন সংগ্রাম। দেশের বাড়ি ছেড়ে, মেহেরপুরের বাড়িতে হবিগঞ্জের কুমুদ উকিলের ছেলের শিলচরে ইটভাট্টার দেখাশুনা করার জন্য। পেছনে পড়ে রইল ক্ষিতীন্দ্রমোহনের নির্জন-মর্মর মূখর বাঁশের পোতা – তাঁর সাধের গ্রাম – ধূলিয়াখাল, রতনপুর, পোঃ গোপায়, জেলাঃ সিলেট। ঠিকানা মুছে গেল চিরতরের মতো। ঠিকানা পাল্টে যাওয়ার পর ক্ষিতীন্দ্রমোহনের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল কারণ দেশ ছাড়তে চান নি ক্ষিতীন্দ্রমোহন কিন্তু শেষপর্যন্ত দাঙ্গা চরমে উঠলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন।

ইট ভাটায় ইট কিনতে এসে উমানাথ বাবুর সঙ্গে পরিচয় ক্ষিতীন্দ্রমোহনের। পরিচয় থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই পরিবারই শেকড় ছিন্ন হয়ে এ দেশে এসেছিলেন তাই দুজনের সাক্ষাতে আবার দেশের বাড়ির প্রাণ ফিরে পান দুজনেই। তবে ক্ষিতীন্দ্রমোহনের এই বসতও আর বেশিদিন টিকে না। বন্যায় পরপর দুবছর কোম্পানির লোকসান হওয়ায় শেষপর্যন্ত শিলচর ছেড়ে সামান্য কিছু ধানের জমি সম্বল করে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠলের। নতুন ঠিকানা হল করিমগঞ্জের শ্রীরামপুর গ্রাম। অভাব অনটনে দিনকাটে ক্ষিতীন্দ্রমোহনও তার স্ত্রী চারুশশীর। দীর্ঘ

বারোবৎসর পর চারুশশীর অনুরোধে আবার উমানাথের বাড়িতে আসতে বাধ্য হন। তাঁর বুকপকেটে উমানাথবাবুর স্ত্রী প্রীতিলতাকে লেখা চারুশশীর চিঠি। চিঠিতে লেখা-

> "দিদি আপনার ভাইয়ের চোখ অপারেশন না করাইলে নয়। ক্ষেত জমি প্রায় নাই বলিলেই চলে। চোখ না থাকিলে যজমানিও চলে না।"[১০]

বাস থেকে নেমে ক্ষিতীন্দ্রমোহন তার চেনা শিলচর শহরকে আর চিনে উঠতে পারেন না। পরিবর্তিত সময়ের ছাপ দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে যান। আসলে বাস্তুহীনদের জীবন সংগ্রাম, শিলচরে বর্তমান – অতীত – সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক পরিসরের পরিবর্তন। নতুন মাটিতে মানবিক সম্পর্কের আবিষ্কার এসবই ক্ষিতীন্দ্রমোহনের স্মৃতির উজান বেয়ে এসেছে।

নিলিপ পোদ্দারের 'বাস্তুভূমি' গল্পটি মূলত ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরার ভূমিতে উদ্বাস্তু চাপ এতটাই প্রবল হয় যে এই অঞ্চলের জনজাতিরা ভূমির জন্য বিদেশি বিতারণের ডাক দেয়। ফলে ত্রিপুরায় দেশভাগের যন্ত্রণা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাবের যন্ত্রনা থেকে পৃথক। এই পৃথক যন্ত্রণা উঠে এসেছে এ রাজ্যের ছোটগল্পে। বিস্তৃত হয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা হাহাকার। এই গল্পে উঠে এসেছে শ্রীপদের বেঁচে থাকার লড়াই। যেখানে শ্রীপদকে সাত আট বৎসর বয়সে বাবার হাত ধরে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসতে হয় চাকলা রোশনাবাদ থেকে সোনামোড়াতে। তবে সোনামোড়াতে এসে জানতে পারল –

> "এটাও ত্রিপুরা, ত্রিপুরার সোনামোড়া। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। এদের নাম উদ্বাস্তু। দেশভাগে তাদের গায়ে ছাপ মারা হল উদ্বাস্তু। তারপর কেটে গেছে অনেকদিন। এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে শেষঅবধি এই তেলকাজলা গ্রামে তাদের ঠাঁই হল। তারপর থেকে শুধু বেঁচে থাকার লড়াই।"[১১]

তবে প্রথম পর্বে যখন ত্রিপুরা উদ্বাস্তু বসতি শুরু হয় তখন ত্রিপুরা রাজ্যশাসিত স্বাধীন রাজ্য, ব্রিটিশ ভারতের অংশ নয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র দ্বারা সরাসরি পরিচালিত নয়। গল্পে উল্লেখিত এই চাকলা রোশনাবাদ ছিল ব্রিটিশ ভারতে, রাজারা বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য টিপ্পেরা নামে পরিচিত স্বাধীন এলাকা ছাড়াও ব্রিটিশ ভারতের একটি স্টেট বজায় রেখেছিল, যা টিপ্পেরা জেলা বা চাকলা রোশনাবাদ, যা বর্তমানের বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল নামে পরিচিত। অর্থাৎ দেখা গেল দেশভাগের আগে শ্রীপদ যে গ্রামে ছিল এবং দেশভাগের পর যে গ্রামে এসেছে দুটিই একটি রাজ্যের অন্তর্গত। তথাপি শ্রীপদের মনে বাস্তুহারানোর এক অদৃশ্য ভয় সবসময় কাজ করত। চাকলাতে থাকতেও তাকে দেখতে হয়েছিল অনেক আগে থেকে বাপ ঠাকুরদাদের ত্রিপুরার রাজাদের কড় দিয়ে আসা জায়গাতেও কীভাবে প্রতিবেশিদের চোখে, খেলার সাথীর মুখে শুনতে হয়েছে,

> "তোদের সাথে আর খেলতাম নারে। তোরা আমরার জায়গা থেইক্যা ভাগ। এই দেশটি আমরার, হেইডা তোরার, ওইখানে যা। আঙুল দিয়ে পুব দিক দেখাত।"[১২]

নতুন বসতও শ্রীপদকে সেই ভয় থেকে রেহাই দেয় নি। শ্রীপদের স্ত্রী মালতী যেখানে কাজে যায় সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হয়-

> "তোমরা বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছ? কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো? যা দিনকাল পড়েছে!"[১৩]

শ্রীপদ একথার কোনো উত্তর দিতে পারেনি। আসলে শ্রীপদ কোনোদিন এদিকটা ভেবে দেখেনি। আর কাগজ! তাদের বাড়িতে কোনো কাগজপত্রই নেই, দরকারো পড়ে নি। যাও একটা রেশন কার্ড ছিল, সেটাও এখন অচল। মাঝে মাঝে শহর থেকে সরকারিবাবুরা কীসব কাগজপত্র চায়, যা তার কাছে নেই। এমনকি, এ গ্রামের বেশি অংশের মানুষেরই নেই। তাই রেশন বন্ধ। ভোটের সময় মাতব্বররা এসে শুধু আশার বানী দেয় আর ভোট চায়। কিন্তু সুবোধ মাস্টার যে সব কাগজপত্রের কথা বলে, সে কোনোদিন এসব কাগজ পত্রের নামও শুনে নি, দেখেও নি।

আজকাল গ্রামের চারপাশে শ্রীপদ শুনতে পায় শুধু ভোটার আইডি কার্ড, রেশন কার্ড, সিটিজেনশিপ, পি আর সি, আধার কার্ড, আর মনে মনে ভাবে, "কী কাগজ না থাকলে আমরারে এই দেশতে বাইর কইর্‌য়া দিব?" তারা তো ত্রিপুরার বাসিন্দা, চিরকাল ছিল, এখনও। ভারত, পুর্ব-বাংলা, পশ্চিম-বাংলা, পুর্ব-পাকিস্তান, বাংলাদেশ – এসব কথা সে শুনেছে, দেখেনি কোনোদিন। ছোটোবেলায় রাতের অন্ধকারে বাবার হাত ধরে সে যখন বড়োদের সাথে কেবল ছুটেছে

আর ছুটেছে, ভোর হতেই একটা শব্দ শুনেছে 'উদ্বাস্তু', 'রিফিউজি', আর দেখেছে হাজার হাজার মানুষ আর মানুষ। চিৎকার করছে, কাঁদছে, পরিজনদের খুঁজছে। এসব ভাবতে ভাবতে তাঁর দুচোখ জুড়ে আঁধার নামে।

এ ভাবেই ত্রিপুরার সমভূমিতে রাজন্য আমল থেকেই বাস করা বাঙালিদের গভীর ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে হয়েছে। ত্রিপুরার এক কবির ভাষায়- "সিরিল র‍্যাডক্লিফ আমাদের হৃদয় ভাগ করেছে যান্ত্রিক রহস্য দ্বারা/ আমাদের আবেগের সমুদ্র আজ পাথর/ভালোবাসার বর্ণমালা আজ ভূলুণ্ঠিত/বিভক্তি লাইন টেনে।/ভালোবাসার খণ্ডিত অংশ/ আমাদের হাতে/ রক্তাক্ত মাংস টুকরোর মতো/ তুলে দিয়েছে।" লাখো লাখো মানুষ র‍্যাডক্লিফ লাইনের জন্য স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারে নি। তারা বুঝতেই পারল না।[১৪] স্বাধীনতার সময় তারা ঠিক কোনদেশের অধীবাসী হতে যাচ্ছে। লাখো লাখো মানুষকে র‍্যাডক্লিফ আঁকা বিভক্তি লাইন অতিক্রান্ত করতে হয় নিজের বসবাসের জন্য। এটা পৃথিবীর কয়েকটি ঐতিহাসিক সংকটের একটি।

দেশভাগের নিরন্তর দহন প্রক্রিয়াই গড়ে তুলেছে এক একটি গল্পকথাকে। তাই প্রতিটি গল্পেই রয়েছে দেশভাগের ফলে বহন করা দুঃসহ উদ্বাস্তু কথা। রয়েছে ছিন্নমূল অস্তিত্বগুলো কীভাবে দিনের পর দিন স্বার্থান্বেসী রাজনীতির চক্রবূহ্যে চিরকালই ছিন্নমূল হয়ে থেকে গেল – তারই কথা। গল্পকথক ভাঙনের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির ভাঙ্গনকে প্রেক্ষাপট রেখে তৈরি করে গেছেন আখ্যানের কাহিনি সত্ত্বা। আসলে জাতীয়বাদী কিংবা সাম্রাজাবাদীদের দেশ তো জনসাধারণের দেশ হয়ে ওঠে নি কখনও। মানচিত্র দেশ হল না, দিয়ে গেল ছিন্নমূল সামূহিক সত্ত্বা। কবি তারা পদের ভাষায় –

"শুধু এক মানচিত্র ভাঙাঘরে দেয়ালে নিয়ত
উলঙ্গ রিলিফ ম্যাপ আধাখ্যাপা ড্রয়িং মাস্টার
উপহার দিয়েছিল রক্তের স্রোতের মত নদী
দাঁত বের করা হিংস্র অন্ধকার আদিম পাহাড়।"
(ভারতবর্ষ মানচিত্র : তারাপদ রায়)

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী দীপক : 'উদ্বাস্তু', 'শতক্রতু' নবপর্যায়- পঞ্চম সংখ্যা, ISSN NO- 0976 - 5344, সম্পাদনা- তপোধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্য, শিলচর- ৭৮৮০০৫, ২০১৬, পৃ. ২৯
২. তদেব, পৃ. ৩২
৩. তদেব, পৃ. ৪৩
৪. তদেব, পৃ. ৪৪
৫. ভট্টাচার্য, মিথিলেশ : 'গল্প ও গল্পগুলো', 'শতক্রতু' নবপর্যায় তৃতীয় সংখ্যা, ISSN NO - 0976 - 5344, সম্পাদনা- তপোধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্য, শিলচর- ৭৮৮০০৫, ২০১২, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৩
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ৬৭
৯. তদেব, পৃ. ৬৮
১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'উজান', 'গল্পের শতক্রতু', সম্পাদনা- তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০১৭, পৃ. ৫০২
১১. পোদ্দার, নিলিপ : 'বাস্তুভূমি', যাপন কথা অষ্টম সংখ্যা, সম্পাদনা- কান্তারভূষণ নন্দী (অবৈতনিক), গুয়াহাটি ২০২১ জানুয়ারি, পৃ. ১০৫
১২. তদেব, পৃ. ১০৪
১৩. তদেব, পৃ. ১০৭
১৪. চক্রবর্তী, বিমল : 'ত্রিপুরার কথাসাহিত্যে দেশভাগ', যাপন কথা, অষ্টম সংখ্যা, সম্পাদনা- কান্তারভূষণ নন্দী (অবৈতনিক), গুয়াহাটি ১১, ২০২১ জানুয়ারি, পৃ. ৫৫